শিক্ষা থেকে কাগজ বিদায় করতে চাই

মোস্তাফা জব্বার

ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা যখন বলেছি, তখন এটি জেনেশুনেই বলেছি যে এনালগ যুগের কাগজ বিদায় করতে হবে। এখনও যাদের এই বিষয়ে সন্দেহ আছে তারা আরও কিছুদিন অপেক্ষা করে আমার সাথে একমত হতে পারেন। তবে যেমন করে সিসার হরফ, পাল তোলা নৌকা, সেলুলয়েড, টেপ বিদায় হয়েছে তেমন করে কাগজও বিদায় নেবে। ডিজিটাল সভ্যতা কাগজের সভ্যতার কবরের ওপরই জন্ম নিচ্ছে। এজন্য প্রশাসন থেকে কাগজ বিদায় হতে হবে। বিদায় হতে হবে শিক্ষা থেকে। জীবনের বহু কাজে এখন আমরা আর কাগজের সন্ধান করি না। সামনের দিনে কোথাও কাগজ থাকবে না। আমি নিশ্চিত সময় লাগলেও প্রশাসন থেকে কাগজ বিদায় নেবার প্রক্রিয়া চলছে। শিক্ষা থেকেও এটি বিদায় নেবে। এ লেখায় পাঠদান পদ্ধতি থেকে কাগজ বিদায় করা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

হয়তো অনেকেই অবাক হবেন যদি দেখেন, শিশু শ্রেণি, প্রথম শ্রেণি বা দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া ৫-৭ বছর বয়সী শিশুরা স্কুল ব্যাগটাতে বই-খাতা-কলম না নিয়ে শুধু একটি পানির ফ্লাস্ক ও একটি ল্যাপটপ/ট্যাব/স্মার্টফোন ঢুকিয়ে স্কুলে চলে গেল। বিদেশের কোনো স্কুলের এমন দৃশ্য দেখলে কেউ অবাক হন না। ডেনমার্কের কোনো স্কুলে ছেলেমেয়েরা স্কুল ব্যাগ বা বই নেয় না। ব্রিটেনের শতকরা ৮৯ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী ট্যাব দিয়ে পড়শোনা করে। সিঙ্গাপুরের স্কুলে সবচেয়ে জনপ্রিয় বস্তুটির নাম আইপ্যাড। মালয়েশিয়ার স্কুলগুলোর নামই হয়ে গেছে স্মার্টস্কুল। বাংলাদেশের স্কুলেও ডিজিটাল ক্লাসরুম হয়েছে। তবে এখনও কোনো স্কুলের কোনো ক্লাসের সব ছাত্রছাত্রী বই ছাড়া ট্যাব দিয়ে লেখাপড়া করে না। এজন্য বাংলাদেশের কোনো স্কুলের ছেলেমেয়েদেরকে এমন স্মার্ট হিসেবে দেখার কথা হয়তো অনেকে ভাবতেই পারছেন না। কিন্তু এটি হতে পারে। হওয়া সম্ভব। এমনকি ২০১৬ সালেই যদি এমনটি ঘটে যায়, তবে অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না।

আসুন প্রথমেই প্রেক্ষিতটি নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্রসঙ্গটা উঠেছিল স্কুল ব্যাগের ওজন নিয়ে। ২০১৪ সালের নভেম্বরে ঢাকার জাতীয় দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় একটি শীর্ষ সংবাদ পরিবেশন করা হয়। যাতে বলা হয় যে, আমাদের শিশুদের স্কুলব্যাগটা বড্ড ভারি। এরা জরিপ করে দেখিয়েছে, ১৫-২০ কেজি ওজনের শিশুকে ৬ থেকে ৮ কেজি ওজনের স্কুল ব্যাগ বহন করতে হয়। এরাই ডাক্তারদের পরামর্শ নিয়ে বলেছে, শিশুর মোট ওজনের শতকরা দশ ভাগের বেশি ওজনের ব্যাগ তার কাঁধে দেয়া উচিত নয়। এর ফলে শিশু শারীরিকভাবে ব্যাপক ক্ষতির শিকার হতে পারে। তারা নানা পরামর্শ দিয়ে বলেছে, শিশুর বই কমিয়ে, স্কুলে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করে, খাতার পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে ব্যাগের ওজন কমানো যায়। প্রচলিত শিক্ষাদান পদ্ধতিতে এইসব চিন্তাভাবনা নিয়ে সামনে এগোনো যায়। প্রচলিত পদ্ধতির শিক্ষা, ক্লাসরুম, মূল্যায়ন ও পাঠদান পদ্ধতির জন্য হয়তো এসব সহায়ক হতে পারে। কিন্তু দুনিয়ার দিকে তাকালে আমাদেরকে অন্য কিছু ভাবতে হবে। সারা দুনিয়ায় এখন বইভিত্তিক স্কুল ব্যাগটা উধাও হচ্ছে। আমরা কি বিশ্বজুড়ে প্রবাহমান এই নতুন ধারাকে এড়িয়ে যেতে পারব?

কার্যত শিশুদের বইয়ের ওজন, খাতার ওজন বা পানির বোতল কোনোটাই কমবে না। বরং যদি ব্যাগটার ওজন আরও বাড়ে, তবে তাতে আমাদের অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। কারণ প্রতিবছরই শিশুর ঘাড়ে নতুন বই চাপানো হয় এবং সেই বইয়ের ওজন কখনও শিশুর ওজনকে অতিক্রম করে যায়। তাই ব্যাগের ওজন বাড়ার এই সমস্যার সমাধানও পাঠক্রম কমানোর আন্দোলন বা বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করার পথেই হবে না।

গত শতকের নব্বই দশকেও আমার সম্পাদিত নিপুণ পত্রিকায় শিশুদের ওজনদার স্কুল ব্যাগের প্রসঙ্গ আলোচনা করেছিলাম। প্রস্তাব করেছিলাম– শিশুদেরকে যেন তথাকথিত বিদ্যার ওজনে পিষ্ট না করা হয়। এসব কথা সরকারের শিক্ষানীতিতে আছে। সরকারিভাবেও পাঠক্রম পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। কিন্তু দিনে দিনে বই এবং বিষয়ের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বৈষম্যটা কেমন তার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে। আমাদের দেশে পঞ্চম শ্রেণিতে শিশুরা পড়ে ৬টি বিষয়। সেই শিশু ষষ্ঠ শেণিতে পড়ে ১৩টি বিষয়। যারা এসব বিষয় পাঠ্য করে তারা কি কখনও ভাবে শিশুটির মেরুদণ্ডের জোর কতটা? এক বছরের ব্যবধানে একটি শিশুকে কি কোনোভাবে নতুন সাতটি বিষয় পড়তে দেয়া যায়? দুনিয়ার কোনো শিক্ষা বিশেষজ্ঞ কি এমন পরামর্শ দিতে পারেন? দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের পণ্ডিতেরা সেই কাজটি করেছেন। শুধু কি তাই! পাঠক্রমে যে পরিমাণ বই বা পাঠক্রম আছে বেসরকারি, ইংরেজি মাধ্যম এমনকি মাদ্রাসারও বই বা পাঠক্রম তার চেয়ে অনেক বেশি। শিশু শ্রেণির একটি শিশুর যেখানে খেলায় খেলায় পড়ার কথা, সেখানে তাকে বইয়ের পর বই চাপিয়ে দেয়া হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুধু কমিশন পাওয়ার জন্য বাড়তি বই পাঠ্য করা হয়। শিশুর জন্য এক সাথে বাংলা-ইংরেজি ও আরবি ভাষার অত্যাচার তো আছেই। শিশুকেই বিজ্ঞান-গণিত-নৈতিকতা-ধর্ম সবই শিখতে হয়। ▶

শুধু ডিজিটাল ক্লাসরুম নয়, প্রতি শিক্ষার্থীর হাতে ল্যাপটপ চাই

আমার প্রস্তাবনাগুলো খুবই সরল। প্রথমত দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সব ক্লাসরুমকে পর্যায়ক্রমে ডিজিটাল করতে হবে এবং এজন্য প্রজেক্টর নির্ভরতা রাখা যাবে না। প্রজেক্টর বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য উপযোগী নয়। প্রজেক্টরের ল্যাম্প নষ্ট হলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো কিনতে পারে না। এর দাম প্রায় প্রজেক্টরের কাছাকাছি। বরং ফ্লেক্সি বোর্ড বা বড় পর্দার মনিটর/টিভি ব্যবহার করে প্রজেক্টরের বিকল্প তৈরি করা যায়। এতে শুধু ব্যয় কমবে না বরং টিভি দেখানোও সম্ভব হবে। বড় পর্দার সাথে ল্যাপটপ ব্যবহার হলেও ছাত্রছাত্রীদের হাতে ল্যাপটপ/ট্যাবলেট পিসি দেয়া যায়। ব্রিটেন যে সিদ্ধান্তটি নিয়েছে সেটি বাংলাদেশে বাস্তবায়ন করা যায়। আমাদের যে বিপুল পরিমাণ ল্যাপটপ ট্যাবলেট প্রয়োজন, সেগুলো বিদেশ থেকে আমদানি না করে টেলিফোন শিল্প সংস্থা বা বেসরকারি কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় দেশেই উৎপাদন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের দ্বিতীয় সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। ৬ আগস্ট ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সেই সভার ৭.১, ৭.৩ ও ৭.৫ নাম্বার সিদ্ধান্তে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

শুধু ডিজিটাল ডিভাইসই নয়, এতে ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত নির্মাণ করতে হবে। এসব উপাত্ত হতে হবে পেশাদারি মানের। সেইসব কনটেন্ট সম্বলিত ল্যাপটপ/ট্যাবলেটগুলোকে শিক্ষার্থীদের হাতে দিতে হবে। এতে থাকতে হবে ওয়াইফাই এবং ইন্টারনেট সংযোগ।

এই ট্যাবলেটগুলোর ওজন খুব কম হবে। শিশুরাও সহজেই এটি বহন করতে পারবে। এটি মজবুত হবে যাতে ছেলেমেয়েরা সাধারণভাবেই এটি ব্যবহার করতে পারে। এর মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ যাতে প্রতিটি গ্রামেই পাওয়া যায় তার ব্যবস্থাও করতে হবে। সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে, এর দাম হতে হবে খুব কম। সরকার বছরে যে হাজার হাজার কোটি টাকা বই মুদ্রণের জন্য খরচ করে তার অংশবিশেষ ব্যবহার করেই দেশের শিক্ষার্থীদের হাতেই ল্যাপটপ/ট্যাবলেট পৌঁছানো যাবে। এজন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও অবকাঠামো তৈরির কাজটিও সরকারকেই করতে হবে।

সরকার ইতোমধ্যে ডিজিটাল ক্লাসরুম গড়ে তোলার যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে তাকে নতুন করে পর্যালোচনা করতে হবে এবং যেসব ত্রুটি ধরা পড়বে সেগুলো সংশোধন করতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে হার্ডওয়্যার সংগ্রহ করার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে হবে এবং সফটওয়্যার তৈরির ক্ষেত্রে পেশাদারিত্বকে গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার সময় তারা যাতে সঠিকভাবে বাংলা বর্ণ ব্যবহার করে সেটিও লক্ষ রাখতে হবে। রোমান হরফ দিয়ে বাংলা লেখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে। ▶

স্কুল ব্যাগের ওজন কমানোটা সমাধান নয়। বরং এখন স্কুল ব্যাগটা ফেলে দেয়ার সময়। আমরা নিশ্চিত করেই জানি, ডেনমার্কের স্কুলে বই দিয়ে লেখাপড়া করানো হয় না। সিঙ্গাপুরের ছেলেমেয়েরা আইপ্যাড দিয়ে পড়াশোনা করে। মালয়েশিয়ার স্মার্টস্কুলগুলোতে কাগজের বই কোনো প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গই নয়।

যুক্তরাজ্যের স্কুলগুলো সম্পর্কে ৪ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে। খবরটির অংশবিশেষ দেখেই বলা যাবে ভারি ওজনের স্কুলব্যাগ উধাও করাটাই সমাধান।

খবরটির শিরোনাম– **'যুক্তরাজ্যের ৭০ শতাংশ বিদ্যালয়ে ট্যাবলেট'**। **খবরটি** এরকম : **'যুক্তরাজ্যের প্রায় ৭০ শতাংশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে ট্যাবলেট কমপিউটার। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নতুন প্রযুক্তির সুবিধা দিতে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তির সুবিধা নিতে ট্যাবলেট কমপিউটার ব্যবহার বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে যুক্তরাজ্য। আর সেজন্যই বিদ্যালয়গুলোতে ট্যাবলেট কমপিউটার দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি এক গবেষণায় এ তথ্য জানা গেছে। গবেষণার অংশ হিসেবে ৬৭১টি বিদ্যালয়ে জরিপ চালানো হয়। বিদ্যালয়গুলোতে ট্যাবলেটের এমন ব্যবহার বাড়ার ফলে প্রযুক্তির প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ যেমন বাড়ছে, তেমনি বাসা এবং বিদ্যালয়ে প্রযুক্তির নানা সুবিধাও ব্যবহার করছে শিক্ষার্থীরা। বার্বি ক্লাক অব দ্য ফ্যামিলি, কিডস অ্যান্ড ইয়ুথ রিসার্চ গ্রুপের করা এ গবেষণায় বলা হয়েছে, যুক্তরাজ্যের ৬৮ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৬৯ শতাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ট্যাবলেট কমপিউটার ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে। এর মধ্যে প্রায় ৯ শতাংশ বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য একটি ট্যাবলেট ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। এসব শিক্ষার্থীর মধ্যে বিদ্যালয়ের বাইরে বাসায় প্রায় ৭০ শতাংশ তরুণ শিক্ষার্থী ট্যাবলেট কমপিউটার ব্যবহার করে। শিক্ষার্থীদের ট্যাবলেট ব্যবহারের এমন হার ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বেশ সহায়তা করছে বলে জানিয়েছে গবেষক দল। যে হারে এ সংখ্যা বাড়ছে তাতে ২০১৬ সালের মধ্যে ট্যাবলেট ব্যবহারের সংখ্যা বেড়ে হবে ৯ লাখ। চলতি বছরে এ সংখ্যা হলো ৪ লাখ ৩০ হাজার।'**

যুক্তরাজ্যের শিশুদের এই পরিসংখ্যান বস্তুত একটি ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত দিক-নির্দেশনা প্রদান করছে।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি বলেছিলেন, তিনি এদেশের ছাত্রছাত্রীদেরকে ল্যাপটপ নিয়ে স্কুলে যেতে দেখতে চান। স্বপ্ন দেখার এই মানুষটি ২০০৮ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণা করে বস্তুত দেশটির আগামী দিনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।

ডিজিটাল ক্লাসরুম ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

২০১৩ সালের ২১ মে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল ক্লাসরুমের উদ্বোধন করেছিলেন। এরপর ডিজিটাল ক্লাসরুম নিয়ে আলোচনা কম হয়নি। কর্মকাণ্ডও কম হয়নি। কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর কথা কেউ শুনে না। ১৯৯৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর গাজীপুরে মাল্টিমিডিয়া স্কুলেরও উদ্বোধন করেছি। সেই কবে থেকে শিক্ষামূলক মাল্টিমিডিয়া কনটেন্টস তৈরি করছি। সেই কবে থেকে মাল্টিমিডিয়া প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। যত দেন দরবার করা দরকার সেইসব করছি। তবুও কাউকেই বোঝাতে পারিনি, কাগজ-কলম-চক-ডাস্টারের দিন শেষ। যখন দেখলাম, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সরকার একলাফে ২০ হাজার ৫শ' মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম গড়ে তুলছে, তখন আমার আনন্দ আর কে দেখে। কিন্তু প্রথম হোঁচট খেয়েছিলাম যখন দেখেছিলাম এই প্রকল্পে বাংলা লেখার কোনো সফটওয়্যারই নেয়া হয়নি। নিজেকে প্রশ্ন করেছিলাম– এর মানে কি এইসব ক্লাসরুমে বাংলা লেখা হবে না? ওরা সবাই কি ইংরেজি মাধ্যমে পড়বে এবং এমনকি বাংলাকে একটি ভাষা হিসেবেও পড়বে না? জবাব পেয়েছিলাম, না বাংলা লেখা হবে– তবে সেটি রোমান হরফ দিয়ে। ইংরেজি হরফ দিয়ে বাংলা লিখে সেটিকে বাংলা বানানো হবে। এরপর আরও জানলাম, এই প্রকল্পে যেসব প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে সেগুলোতেও রোমান হরফেই বাংলা লেখা শেখানো হয়েছে। বুঝেছিলাম বরকত-সালাম-রফিক-জব্বারের যোগ্য উত্তরসূরিরাই এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বাংলার প্রতি সরকারের একাংশের দরদের আরও একটি নমুনা সম্প্রতি জেনেছি। সরকারের আইসিটি ডিভিশন সরকারি কর্মকর্তাদেরকে ২৫ হাজার ট্যাব দিয়েছে। একটি চীনা কোম্পানির তৈরি এই ট্যাব নিয়ে কমপিউটার কাউন্সিলে তুলকালাম হয়েছে। এর আমদানিবিষয়ক জটিলতা আমরা সবাই জানি। এখন শুনছি সেইসব ট্যাব দিয়ে সরকারি কর্মকর্তারা বাংলা লিখবে কিনা সেটি কেউ চিন্তা করেই দেখেনি। ট্যাবগুলো বিতরণের আগে অ্যান্ড্রয়িড অপারেটিং সিস্টেমে চলা এসব ট্যাবে বাংলা সফটওয়্যার ব্যবহার বিষয়ে জানতে চেয়ে বোকা হয়েছিলাম। কমপিউটার কাউন্সিল ট্যাবে বাংলা ব্যবহার বিষয়টিকে পাত্তাই দেয়নি।

একইভাবে সরকার যখন ডিজিটাল ক্লাসরুম গড়ে তুলে তখন তারস্বরে চিৎকার করে প্রকল্পটির ত্রুটিগুলোর কথা বলেছি। শুধু যে হার্ডওয়্যার কেনায় ব্যর্থতা ছিল তাই নয়, যথাযথ কনটেন্ট তৈরি না করে ▸

▸ আমরা শিশুদের জন্য ইন্টারেকটিভ মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার তৈরি করে দেখেছি যে তার প্রতি শিশুরা দারুণভাবে আকৃষ্ট হয় এবং তাদের লেখাপড়ার মান ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। শিক্ষা উপকরণ হিসেবে সফটওয়্যারের গ্রহণযোগ্যতা শিশুদের কাছে প্রচণ্ড। বিজয় শিশু শিক্ষা বা বিজয় প্রাথমিক শিক্ষার সহায়তায় আমরা সেটি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি।

আমরা ২০১৬ সালে নেত্রকোনার পূর্বধলার একটি স্কুলে প্রথমবারের মতো ল্যাপটপভিত্তিক একটি ক্লাসরুম চালু করতে যাচ্ছি। স্কুলটির প্রথম শ্রেণির সব ছাত্রছাত্রীকে ক্লাসরুমে ও বাড়িতে ল্যাপটপ পিসি ব্যবহার করতে দেয়া হবে। যদিও তাদের পাঠ্যবই পুরোই বাদ দেয়া হবে না, তবুও লেখাপড়ার প্রধান কেন্দ্র হবে তাদের ট্যাব। ট্যাবগুলো হবে উইন্ডোজনির্ভর। এতে তারা কমপিউটারের ব্যবহারও শিখবে। কমপিউটারের প্রাথমিক কাজ যেমন এটি চালু করা, অপারেটিং সিস্টেম, অফিস, ইন্টারনেট ইত্যাদি ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যবই এবং সফটওয়্যার এতে দেয়া হবে। বিজয় প্রাথমিক শিক্ষা ১ সিরিজের বাংলা, ইংরেজি ও গণিত সফটওয়্যার থাকবে তাদের ট্যাবে। ইতোমধ্যেই শিক্ষিকাদেরকে এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু হয়েছে। এই বছরের ডিসেম্বরে স্কুলটির উদ্বোধন হবে। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য শিশুদেরকে ইন্টারেকটিভ মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার দিয়ে শিক্ষা দেয়া।

অন্যদিকে সরকারের টেলিকম বিভাগ ঢাকা-গাজীপুরের ২০টি প্রাথমিক স্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদেরকে ল্যাপটপ দিয়ে সজ্জিত করার একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। তারা ৮ ইঞ্চি পর্দার ট্যাবকে এজন্য পছন্দ করেছে। এই ডিজিটাল যন্ত্রটি একাধারে ল্যাপটপ ও ট্যাব হিসেবে কাজ করবে। এই প্রকল্পটির আওতায় প্রায় ৬ হাজার ল্যাপটপ ছোট শিশুদের হাতে দেয়া হবে। এতে তাদের পাঠ্যবইও থাকবে। তাদের ক্লাসরুমগুলোকে ডিজিটাল ক্লাসরুম হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এইসব ক্লাসরুমে একটি ১০ ইঞ্চি মাপের ল্যাপটপ এবং ৩৯ ইঞ্চি মাপের টেলিভিশন থাকবে। টেলিফোন শিল্প সংস্থা পুরো প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণসহ যন্ত্রপাতির দেখাশোনাটিও তারাই করবে। আমি ধারণা করি এটি একটি পাইলট প্রকল্প। প্রকল্পটির বিবরণ দেখে আমার কাছে মনে হয়েছে, সফল করার জন্য যেসব উপাদান কোনো একটি প্রকল্পে থাকা দরকার তার সবই এতে রয়েছে। শুধু আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বা ধীরগতির কারণে যদি পাইলট যথাযথ সুফল না দেয় তবে দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। কিন্তু এর জন্য যন্ত্রপাতি-উপাত্ত ও সেবার যে সমন্বয় ঘটানো হয়েছে, তা বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় অনুকরণীয় হয়ে থাকতে পারে।

কোনো সন্দেহ নেই, এর ফলে আমরা তাদের ঘাড়ে চাপানো স্কুল ব্যাগটা উধাও করে দিতে পারব। পরের বছর স্কুলটির আরও ক্লাসকে এভাবে ডিজিটাল করা হবে। আমি আশা করি, পূর্বধলার এই স্কুলটি বাংলাদেশের ডিজিটাল শিক্ষার প্রতীক হিসেবে পরিগণিত হবে।

এই কথাটি মনে রাখা দরকার, শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর ছাড়া ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে উঠবে না। সবার আগে তাই শিক্ষাকে ডিজিটাল করতে হবে কজ

এসব ক্লাসরুম গড়ে তুলে মূলত একটি নিষ্ফল প্রকল্পই গড়ে তোলা হয়েছে। এরপর আর তেমন কোনো কথা বলিনি। সেদিন হঠাৎ করে দেখি একটি পত্রিকায় সেই মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম খবর হয়েছে।

দৈনিক আমাদের সময়ের ১৮ অক্টোবর ২০১৪ সংখ্যায় ৩-এর পাতায় এম এইচ রবিনের লেখা 'মালটিমিডিয়া ক্লাসরুম কার্যকরের বিশেষ উদ্যোগ' শিরোনামে একটি ছোট খবর ছাপা হয়েছে। খবরটি বাংলাদেশের ডিজিটাল রূপান্তর নিয়ে যাদের আগ্রহ আছে তাদের নজরে পড়ার কথা। খবরটি এরকম– 'সারা দেশে স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষের কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিশেষ উদ্যোগ হাতে নিয়েছে সরকার। ২০ হাজার ৫শ' শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল কাসরুম এবং ডিজিটাল কনটেন্টের মাধ্যমে পাঠদান কার্যক্রম নিশ্চিত করতে মাস্টার ট্রেইনারের দায়িত্ব পালন করবে সাড়ে ৪ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

আইসিটি প্রকল্পের তথ্যানুযায়ী, প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত সাড়ে ৪ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'লিডারশিপ' হিসেবে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করবে। এসব প্রতিষ্ঠানকে মহানগর, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরের বেসরকারি ৮০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৬০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৫টি কলেজ এবং ৫টি মাদ্রাসা রয়েছে। ঢাকা মহানগরের সব সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা এর আওতায় আসবে।

জানা গেছে, মালটিমিডিয়া কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, তাতে সরকারি কলেজগুলোকে আলাদা করে মনিটরিং করা হবে। এ বিষয়ে যথাযথ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম (এটুআই) চিঠি দিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরকে।

এটুআই প্রকল্পের ই-লার্নিং স্পেশালিস্ট প্রফেসর ফারুক আহমেদ স্বাক্ষরিত পাঠানো ওই চিঠিতে বলা হয়, মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষকদের তৈরি ডিজিটাল কনটেন্ট কার্যক্রম যথাযথভাবে চালু নেই এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের পঠন-পাঠন কার্যক্রমের গুণগত মান নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। সঠিক তদারকির অভাবে এ প্রকল্প নিষ্ফলা। তাই বাছাইকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাস্টার ট্রেইনারদের দিয়ে এখন ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি ও পাঠদান কার্যক্রম শতভাগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক আবুল কালাম আজাদ আমাদের সময়কে জানান, আশা করছি এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষের যথাযথ সুফল শিক্ষার্থীদের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে। আর এই সাড়ে ৪ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এখন অন্য সব প্রতিষ্ঠানের 'লিডারশিপ' হিসেবে কাজ করবে। নির্বাচিত এসব প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সদস্য, বিদ্যালয় প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ট্রেনিং মডারেশনসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করা হবে। তারা লব্ধ অভিজ্ঞতা পার্শ্ববর্তী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগ করবে।

সূত্র জানায়, আইসিটি প্রকল্পের অধীনে দেশের ২০ হাজার ৫শ' স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় একটি করে ডিজিটাল শ্রেণিকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে একটি করে ল্যাপটপ, স্পিকার, ইন্টারনেট মডেম, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও স্ক্রিন। একজন শিক্ষককে ১২ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ৩০৫ কোটি ৬৫ লাখ ৩৪ হাজার টাকা। আর শিক্ষক প্রশিক্ষণসহ প্রতিটি ডিজিটাল শ্রেণিকক্ষ স্থাপন করতে সরকারের ব্যয় হয়েছে ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা। যদিও প্রায় পৌনে ৪ বছরে প্রকল্পের ৩০৫ কোটি ৬৫ লাখ ৩৪ হাজার টাকার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ২৫৬ কোটি টাকা।

সরকারের এটুআই প্রকল্পের আওতায় শিক্ষাকে ডিজিটাল করার জন্য যেসব উদ্যোগের কথা বলা আছে তার মাঝে ডিজিটাল ডিভাইস প্রদান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল ক্লাসরুম এমনকি শিক্ষকদের দিয়ে কনটেন্ট তৈরির বিষয়ও রয়েছে। এই বিষয়ে দৈনিক আমাদের সময়ের ১৮ অক্টোবর ২০১৪ সংখ্যায় ৩-এর পাতায় এম এইচ রবিনের লেখায় আরও জানা যায়, এটুআইয়ের বিশেষজ্ঞ ফারুক আহমেদের লেখা চিঠিতে বলা হয়েছে, 'মালটিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষকদের তৈরি ডিজিটাল কনটেন্ট কার্যক্রম যথাযথভাবে চালু নেই এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের পঠন-পাঠন কার্যক্রমের গুণগত মান নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। সঠিক তদারকির অভাবে এ প্রকল্প নিষ্ফলা।'

ফারুক আহমেদই এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছেন। এই প্রকল্পের দুটি বড় কম্পোনেন্ট ছিল (ক) হার্ডওয়্যার সংগ্রহ এবং (খ) প্রশিক্ষণ। দুটি কাজই তারা দক্ষতার সাথেই করেছেন। তবে যেসব হার্ডওয়্যার সরবরাহ করা হয়েছিল তার বেশিরভাগেরই এখন ব্যবহার নেই। এমন অভিযোগ আছে যে, প্রতিষ্ঠানপ্রধান বা ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রভাবশালীরা এসব দ্রব্য নিজের বাড়িতেও নিয়ে গেছে। সমস্যাটি আসলে অন্যত্র। এক বাক্যে বলতে হলে বলতে হবে, এখানে ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেয়া হয়েছে। কোনো ধরনের কনটেন্ট ছাড়া হার্ডওয়্যার আর প্রশিক্ষণ দিয়ে আর যাই হোক মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম হয় না। শুধু পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করতে শিখে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা যেসব কনটেন্ট বানাতে পেরেছে তাতে শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর পুরোপুরি হতে পারে না। প্রকল্প তৈরির সময় কনটেন্ট তৈরির বিষয়টি কেন ভাবাই হয়নি সেটি আমি এখনও বুঝতে পারি না।

অন্যদিকে পত্রে মনিটর করার যে বিষয়টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেটি তো এটুআইয়েরই করার কথা। এটুআইকেই এখন নির্ধারণ করতে হবে, মনিটরিং কে করবে বা কীভাবে করবে। মাউশি বা এটুআই কারও পক্ষেই যে কাজটি করা হয়নি, সেটি স্বীকার করে এই প্রকল্প থেকেই একটি মনিটরিং পদ্ধতি খুঁজে বের করে নেয়া ভালো। তবে বিশেষজ্ঞেরা যে নিষ্ফলা মন্তব্য করেছেন তার মূল কারণ প্রকল্পের ত্রুটি। প্রকল্পের তৃতীয় একটি কম্পোনেন্ট যদি থাকত তবে এটি নিষ্ফলা প্রকল্প হতো না।

খবর অনুসারে প্রকল্পের ৪৯ কোটি টাকা এখনও ব্যয় করা হয়নি। শুধু প্রকল্পটিকে একটি রিভাইজ করে এতে পাঠ্যপুস্তকের মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট পেশাগতভাবে তৈরি করার কাজটা করলেই অসম্পূর্ণ প্রকল্প পুরোই সফল হয়ে যাবে। বিশেষজ্ঞেরা এটি কেন বুঝেন না যে, শিক্ষকরা তাদের প্রয়োজনে ছোটখাটো কনটেন্ট তৈরি করতে পারলেও পেশাদারি কনটেন্ট তৈরি করতে পারেন না। যেমন করে সরকারকে পাঠ্যবই ও পাঠক্রম তৈরি করে দিতে হয়, তেমনি করে ক্লাসরুমের পাঠ্যবইকেন্দ্রিক কনটেন্ট সরকারকেই করে দিতে হবে। এজন্য পেশাদার আঁকিয়ে, পেশাদার শব্দ কারিগর, পেশাদার প্রোগ্রামার এবং কনটেন্ট নির্মাতার প্রয়োজন হবে। আমি এটি আশা করতে পারি না, একটি পাঠ্যবই একজন শিক্ষক তৈরি করে দেবেন। সেটি সম্ভব হলে এনসিটিবির দরকার হতো না। সে কারণেই ডিজিটাল কনটেন্ট তাদেরকে দিয়েই করতে হবে যারা এর দক্ষতা রাখেন।

আমাদের জানা নেই এটুআইয়ের নীতি ও কর্মপন্থায় কোনো পরিবর্তন আসবে কি না। তবে যদি পরিবর্তন না আসে তবে বুঝতে হবে প্রকল্পটি ব্যর্থ করার জন্যই হয়তো একে অসম্পূর্ণ করে রাখা হয়েছে। আমাদের মতো গরিব দেশে একটি প্রকল্প তৈরি করা, সেটির জন্য অর্থ জোগাড় করা ও সেটি বাস্তবায়ন করা খুবই দুরূহ কাজ। তাই আমাদের প্রত্যাশা থাকে এই গরিব দেশের টাকা যেন যথাযথভাবে ব্যবহার হয় এবং কোনো প্রকল্প যেন ব্যর্থ না হয়। আমি নিজে শিক্ষার মাল্টিমিডিয়া বা ডিজিটাল রূপান্তরের স্বপ্ন দেখি এবং সেই স্বপ্ন নিয়ে কাজ করি। আমি এরই মাঝে বিজয় শিশু শিক্ষা এবং বিজয় প্রাথমিক শিক্ষা নামের পেশাদারি উপাত্ত বা শিক্ষামূলক সফটওয়্যার তৈরি করেছি। কিন্তু আমার তো কোটি কোটি টাকা নেই, আমি সব শ্রেণির সব পাঠ্যবইকে ইন্টারেকটিভ মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যারে রূপান্তর করতে পারব। বরং কোটি টাকায় সফটওয়্যার বানিয়ে যখন সেটি ২০০ টাকায় বেচতে হয় এবং যখন সেটিও পাইরেসির শিকার হয় তখন আর সামনে যাওয়া যায় না। অনুরোধ করব, তারা যেন এই দৃষ্টান্তগুলো পর্যবেক্ষণ করে সামনের পথে পা বাড়ায়। তাদেরকে নতুন করে চাকা আবিষ্কার করতে হবে না, আমরা ডিজিটাল কনটেন্ট বিষয়ক চাকা আবিষ্কার করেই রেখেছি। তারা যদি সেই চাকাটিকে সামনে নেয়ার ব্যবস্থা করে তবেই সহসাই আমরা শিশুদেরকে মেরুদণ্ড সোজা করে হাঁটাতে পারি। সম্ভবত তখন আমরা বলতে পারব যে স্কুল ব্যাগ নয়, ল্যাপটপ বা ল্যাপটপেই পড়বে আমাদের সন্তানেরা। আমাদের ক্লাসরুমগুলোও তখন মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ডেনমার্ক বা যুক্তরাজ্যের মতো হয়ে উঠবে। আমি এটিও প্রত্যাশা করি, হাঁটুভাঙ্গা ধরনের ডিজিটাল ক্লাসরুম আমাদের দৃষ্টান্ত হয়ে উঠবে না। সুখের বিষয় আমরা স্কুলব্যাগটা যে উধাও করতে পারি তার দৃষ্টান্ত বাংলাদেশেই স্থাপন করেছি। আমাদের মাল্টিমিডিয়া বা ডিজিটাল স্কুলগুলো সেই দৃষ্টান্তই প্রদর্শন করছে। একদিন দেশের সব ক্লাসরুমই এমন ডিজিটাল হবে কজ

ফিডব্যাক : mustafajabbar@gmail.com